North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities

ISSN: 2454-9827 Vol. 7, Issue-5 May -2021

IRJIF I.F. : 5.010

Index Copernicus Value: 57.07 DOI NUMBER: 10.6947/2454-9827.2020.00009.9 Thomson Reuters ID: S-8304-2016

A Peer Reviewed Refereed Journal

সুন্দরবনএলাকারগোসাবাব্লকেরসর্বাঙ্গিনউন্নয়নেস্যারম্যাকিননহ্যামিল্টনেরঅবদানঃ

লেখক – সঞ্জীবমন্ডল

[সংক্ষিপ্তসারঃ হ্যামিল্টন সাহেব স্কটল্যান্ড থেকে ১৮৮০ সালে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর মামার ব্যবসা সামলাতে ভারতে আসেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬-ই ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় আসেন। এই সময় সুন্দরবনের মানুষের করুন কাহিনী শুনেছিলেন কোম্পানীর প্রধান করনিক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হতে। তারপর তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ৪০ বছরের জন্য গোসাবা, রাংগাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া দ্বীপ গুলি ইজারা নিয়ে নিজস্ব এস্টেট স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী সম্পাদন করেছিলেন। সাহেবের কার্যাবলী দেখার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোসাবায় এসেছিলেন এবং সাহেবের ভূয়সী প্রশাংসা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোসাবার "একমুঠো মাটি" নিয়ে ফিরে যান হ্যামিল্টন সাহেব। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হ্যামিল্টন সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন নিউমোনিয়া রোগে। ১৯৩৯ সালের ৬-ই ডিসেম্বর হ্যামিল্টন সাহেব চিরশান্তির দেশে চলে গেলেন। হ্যামিল্টন সাহেবের সুন্দরবন এলাকার গোসাবা ব্লকের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে তাঁর অবদানের সার্বিক মানব উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।]

অধ্বধ ঢ়ম্সজ্জপষয়্লবষ্লঘ্বঢ্ব্য় ঐস্বখঁ ঝবযড়ুধ্জসু ভত্তলুব ঢ়স্বভ ঈঠ্পঁ যুফ্রব্ ভস্খ্লষষ ঢ়ভ্রব ভ্বওঁ্লঘ্লজ ভধ-ন্নবঝ ও লঘ ঝসপঢ়ম্সণ্ঠপষ অধণ্ঠ্ছ্বষ ঝবহ্নবণ্ঠ য়ুঁঘুঁজসু ভত্ত্বুখধখ্যভশ্লঁও ফট্টঢ়ি য়ঁ ঐগ্ববখ্যষ ঝবভপু ভষযধ্র ঢ়ল্লঁ ঈ্নষিঝ্য ঢ়ম্সজ্জপষয়্লব য্বঝধট্ট স্থস্ব খল্লস (১৭৫৭) ভস্বষঁ বধ্বব খ্লষ ঝবযড়ুধ ঘ্লং ঔ্লডু যধ-লুব ব্যষধ্রঁ ঢ়ম্সজ্জপষযব ৪৭২৬ যঘভখ্লল ঐস্বখু ঐষ ল্লফণ্ঠ ৫৫ হধ্বহি যব য়ুখ ঐস্বখঁ লুবম্লড়ষ য্বঢ় ঐগ্লবপৌন্ড্র্ঙ্ ,ভয়জ্জপ্ম, লম্ঢ়স্ত্রল ,ভগত্তদ্বঠ্ব ,লযক্টন্ধ , ক্কঝব ,ভহগ ,ট্টপয্বঢ্ব (লম্ব্ব,ঢ্বওধ্বস,ঔষ্বঔ), ঝ্বধ লুবম্লড়ষ য্বঢ় ঢ়ম্সজ্জপষয়্লব ১০২্ভঠ প্লভষ ল্লফণ্ঠ ৫৪ প্লভ লুবম্লড়ষ যঢ়য্বঢ় খ্লষ ৪৮ প্লভ ঝসৈু য়ণ্ঠ্বলসঠব ঢ্বয়য ১৮৮০ ঢ্বস লণ্ঠ্বখবব লণ্ঠ্বখ্বচ খ্বডডভ্বব্রষ লুলুষ যণ্ঠযঢ্ব ঢ্বলস্ত্বধ ব্য্লধ ট্টঢ়বু ১৮৯৩ভগত্তদ্বঠ্বল্ট ভত্তন্নলভধ্ববছম ঐখড্টঠরভয়ঢ্বয লস্চঈ্লধ খ্ববঝ্লশ্বঘ্লপবু ১৮৯৪ভগত্তদ্বঠ্বল্ট ১৬ঈভ্লঢ়শ্চষ খসখ্বধ ট্টঢ়ব য়ণ্ঠ্বল“ঠব ঢ্বয়যু ঐঈ ঢ়লঁখ্বডডভ্ববষ ভত্তফ্রব খম্ভবখ ড্বভজ্জপগুব্ন য়্লজ্জপণ্ঠ্বভফণ্ঠুঁষ খ্লজ ঢ়ম্সজ্জপষয়্লবষ,লুল্লড়ষ খম্বব খ্বয়ব্র স্থ্লব যণ্ঠনধ য়ুঁজ্লসবভধ্বর ঢ়ম্সজ্জপষয়্লবও ঢ়চ্ছৎঔ্লপ্লগবু

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ৪০ বৎসরের জন্য লীজ নিলেন ১৪৩, ১৪৮ ও ১৪৯ নম্বর লাট, যাদের অবস্থান ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালী থানার এলাকাধীন সুন্দরবনাঞ্চলে যাদের বর্তমান নাম গোসাবা, রাংগাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া। ১৯০৩ সালে বাঁধবাদী নির্মাণ এবং বনাপসারণের পর প্রথম উপনিবেশ গড়ার জন্য আহ্বান জানালেন সৎ এবং কর্মঠ কৃষক পরিবার সমূহকে। তাঁর আহ্বানে সাড়াদিয়ে গ্রামের বর্তমান অধিবাসীবর্গের পিতৃপুরুষবর্গ – এই নতুন সমাজের বিশ্বকর্মাগণ।

১৯০৩ভগত্তদ্বঠ্বল্ট্লঘ্বঢ্বয্বও ষ্বচ্ছয়সঁ সঠ পম্ভঠ ঈঝ্বষ্লববু ১৯০৯ভগত্তদ্বঠ্বল্ট ঢ্বধ্লঝ্লসঁ সঠ্ঠও ঈঝ্বষ্ভ্লসবু ঢ়য্ভল্লসঁ ঝলষ ভ্বষলুব প্বংস ২৩ য্বঝ্বষ ঐখযু ঝসৈ য্বঢ়স খ্লষ ঘ্লং ধ্লম্ভজ্লসব ঝবযড়ুধ্ভপ্লঁজ্লসব বপ্র যুফু স্থস্ব খ্লষ্ভজ্লসব লুবয উন্নঁবল্মসখ খ্বঝু ১৯০৯ ঢ্বস্লঘ্বঢ্বযঁ ঝবঢ়গিণ্ঠ্ভজস ল্ল

৯০০ ঝব্ ১৯০৬ দ্রুস্ ঢ়জ্জঠ অণ্থব্লাগুঝ্ঘঝ– ভত্তধস্ফ্ব খ্লম্ভজ্লসব্ ১৯১০ দ্রুস হত্তলখ্লপষ ল্লফণ্ঠ ঘব্তযয়্লয়ষ যণ্ঠযদ্মন্ড্ব খ্লম্ভজ্লসব্ ১৯১০ দ্রুস পৃ্ধযণ্ঠ্ছুখাদ্রুসঁ দ্মন্ড্বভব, ১৯১১ধ ঢ্বখ যণ্ঠযদ্মন্ড্ব দ্মন্ড্বভব্ ১৯১২ খ্লম্বহব ভ্বখ–হস্থ ঊপণ্থ্বব ঘডব , ১৯১৫খ্ব-অভ্বম্ভঠর্ ঢ্বদ্বস্তঠ দ্মন্ড্বভব, ১৯১৬ ঢ়লযুঁ ড্লন্তধ ঘডব, ১৯১৮ ঢ়লযুঁ ব্বব্ধ্বষ ঔ্লক্ষধ্ব ঢ়লযুঁ ড্লন্তধ ঘডব , ১৯১৯খজ্জপঞ্জুঁ ল্লঢস ম–ল ঘডব, ১৯২০ ঈম্ব্বিঝ প্লস ভত্তধস্ফ্ব , ১৯২১ যঁব হ"ভ্যপণ্থ্বসঁ দ্মন্ড্বভব, ১৯২২খজ্জপঞ্জুঁ ঢ়লযুঁ যণ্থৈ ভত্তধস্ফ্ব, ১৯২৩খ্ব - অভ্বম্ভঠর ভণ্থ্বদ্ ঢ়স্ ঢ্বদ্বস্তঠ ঘডব , ১৯২৫ ফ্বব্য়্লক্ষ্মুঁ খজ্জপণ্ড দ্মন্ড্বভব , ১৯২৭ শ্বুলব্র ষ্বঈঢ়্লস ঘডব , ১৯২৮ ফল–ঘ্বস্ব ঘডব, ১৯৩১ ঈম্বিঝ্খুঝ প্লস ঘডব, ১৯৩২ঘ্বদ্বয্ব ইষ .ইষ . ইঈ . ঈজ্জ্বদ্বঠ্ঠউহবণ্ঠ ভত্তধস্ফ্ব, ১৯৩৪ ভ্বক্ষ ঢ়ঘিডব লয়্বযপণ্থ্বসঁ ঘডব, ১৯০৯ অক্কযধ্ববখ ভত্ত্বন্তলখ্যপণ্থ্বসঁ ভত্তধস্ফ্ব, ১৯১১ দ্রুস্ ঘ্বদ্বয্ব লয়্বঝব্র ভত্তন্য়্লস্বভ, ১৯১৬ ইষ্বলভম্ষ ঔ ঝ্ঠষ্বলভম্ষ ঘত্ত্বলণ্ঠ ঢ়লযুঁ এবপ্বব ড্লন্তধ ভত্তধস্ফ্ব ঐযক্কি্ম্ববখ ভন্তঞ্ধ্বধ লাঢ়ণ্ঠ ছ্বড় ঔ ঘ্লযড়ব্বষ হ্লুঁঝব্ ১৯২৭ ছলভহ"ভ দ্মন্ড্বভব ,১৯২৮ জ্বধ্ব ভত্তদ্মগ্লাধ্হ"ভ ভত্তধস্ফ্ব , ১৯৩২য্বসভম্ষ - ঘ্বদ্বয্ব ঈবস্তদ্বঠ্ঠউঠষ ভত্তধস্ফ্ব , ১৯৩২ উম্লধ ঝ্লধষ্ ঘ্বভত্তঝবব যণ্ঠযদ্মন্ড্বষ ভত্তযধ–ব, ১৯৩৪ দ্রুয্বব ভত্তদ্মগ্লাধ ঐযমিস ঢ়ষিৎব্হ্ল"ভষ দ্রছব্ ১৯৩৫ ফঁ্হৎ্বষ ঝবণ্ঠ ক্কবহ্যপণ্থ্বসঁ ভত্তধস্ফ্ব ১৯৩৬ ঢ্বখ–ল্লম্ভঠি স্বন্ডুযত্ত্বর যণ্ঠযদ্মন্ড্বষ ভত্তযধ–ব ১৯৩৬ দ্রুসষ ৮-ঈ্মযত্ত্বুঁষ ১ ঠ্বখ্বষ খ্বঘ্লঝষ্ ব্বঠ ছ্বসম্ ঘ্বদ্বয্বষ য্বঝ্বষ ঘডব ,

প্রজাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণ করতে নিজের জমিদারি এলাকায় ১ টাকার কাগজের নোট চালু করেছিলেন হ্যামিল্টন (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)। (টাকা ছাপিয়ে ছিল লন্ডনের মেসার্স ওয়াটারলু নামে একটি সংস্থা)। চালু ছিল গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়া দ্বীপে। ৬ ডিসেম্বরে ১৯৩৯ তিনি মারা গেলে ওই টাকার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ওই টাকার বিনিময়ে সমবায় থেকে চাল, তেল, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে পারতেন প্রজারা। নবম শতকে গোড়ায় হিউয়েন সাঙের আমলে প্রথম টাকার নোট ব্যবহার হয় বলে চীন দেশ দাবি করে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন নিজের জমিদারি এলাকায় টাকা ছাপানোর বিষয়টি এই দেশে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গিয়েছে।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ শিয়ালদা হতে ক্যানিং-এর পথে রওনা হন। সঙ্গে প্রখ্যাত কৃষিবিদ কালিমোহন ঘোষ। কয়লার স্ট্রীমে টানা রেলে আসার সময় কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের আগমন। কবিকে চোখে দেখার জন্য প্রচুর লোকের ভিড় হয়ে যায় এবং চম্পাহাটি স্টেশনে, দীর্ঘ সময় থেমে থাকতে বাধ্য হয় সেদিনের সেই কবিস্পর্শে ধন্য ক্যানিং লোকাল। অনেকের মতে সেদিন কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়াও হয় জনসাধারণের পক্ষ হতে কিন্তু এর সত্যতা প্রমাণিত – শুধু এটুকু জানা যায় সেদিন সেই ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে বিকালের দিকে ক্যানিং স্টেশনে আসে কবিকে নিয়ে। ক্যানিং স্টেশনে কবিকে স্বাগত জানানোর জন্য ক্যানিং-এর পক্ষ থেকে কেউ ছিলেন কিনা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ভাসা-ভাসা কিছু কথা প্রচার আছে, আমি তার উল্লেখ করছি না। অল্প বেলা এবং আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য কবিকে সেদিন ক্যানিং এর পোর্ট ক্যানিং "অতিথি নিবাসে" রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। অতিথি নিবাসটি "গোলকুঠী" বলে প্রচারিত ছিল এবং এটির অবস্থান মাতলা নদীর একেবারে তীরে। গোলাকার এই অট্টালিকার নিচ দিয়ে জল চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। বড় বড় দরজা জানালায় সবুজ রঙের খড়খড়ি, বার্মা-সেগুনের আসবাবপত্র শোভিত দ্বিতলের একটি কক্ষে ছিলেন কবি। ট্রলির ব্যবস্থা থাকলেও কবি পায়ে হেঁটেই অতিথি নিবাসে পৌঁছান। কেমন লেগেছিল রাত্রির মাতলা? কেমন লেগেছিল মাতলার বৈকালিক রূপ?– অথবা পরের দিনের সূর্যোদয় শোভিত প্রভাতি মাতলা? ... মহাকাল নিরুত্তর।

পরেরদিন সকালে "বিশ্বভারতীর" সৌজন্যে প্রাপ্ত ছায়াচিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছি ছোটো একটি কাঠের বোটে অশান্ত মাতলার বুকে ভাসছেন কবি এবং কালিমোহন ঘোষ। বাতাসে উড়ছে কবির শুভ্রচুল, আন্দোলিত দাড়ি, পরনে কালো কোট, মাথায় কালো টুপি, হাত বুকের কাছে ভাঁজ করে রাখা নিজস্ব স্টাইলে চেয়ারে বসে আছেন নিজের দিপ্তীতে দীপময় পৃথিবীর রবি-কবি রবীন্দ্রনাথ। ছোটো বোটখানিবিশালহাউজবোটেপৌঁছেদিয়েছিলসেদিনেরসম্মানিতসুন্দরবনেরঅতিথিকে।হাউজবোটমাতলাছাড়িয়েহোগলনদীবেয়েবিদ্যায়এসেথামল।বিদ্যারতীরেসবুজগ্রামখানিই "গোসাবা"।স্যারড্যানিয়েলহ্যামিল্টনেরগোসাবা।লালকার্পেটেস্বাগতজানানোরজন্যঅধীরআগ্রহেঅপেক্ষমানসুন্দরবনেরজনতা।কবিএসেছেনহ্যামিল্টনসাহেবেরআমন্ত্রণে।কিন্তুকেএইহ্যামিল্টন? কেনইবাকবিরগোসাবায়পদার্পণ?

পুরো নাম : স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকনিন হ্যামিল্টন। নিবাস :স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড। জন্ম :৬ই ডিসেম্বর ১৮৬০।

বংশ পরিচয় : মেরী ট্যাড হ্যামিল্টন। যিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে একদা আসীন ছিলেন। তারই রক্ত প্রবাহিত ড্যানিয়েল ম্যাকনিন হ্যামিল্টনের ধমনীতে।

বিখ্যাত ম্যাকনিন অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর কর্ণধার। পি অ্যান্ড ও জাহাজ কোম্পানীর মালিক। ব্যক্তিগত জীবনে একজন "নাইট" উপাধীধারী কীর্তিমান পুরুষ। সাধারণ এক মিশনারী মহিলা তাঁর স্ত্রী। নাম মার্গারেট অথবা মতান্তরে মার্গারীট এলিজাবেথ। তাঁদের কোন পুত্রকন্যা নেই। আছেন ভাইপো জেমস হ্যামিল্টন এবং তার স্ত্রী অ্যানি হ্যামিল্টন। শুধুমাত্র সাগর পারের এই রাজরক্তের আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছেন, এ হতে পারে না - তাহলে কেন? আসুন আমরা হ্যামিল্টনের কর্মজীবনের দিকে তাকাই ...

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। ইংল্যান্ডের একটি বাষ্পচালিত জাহাজ এসে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করল। নেমে এলেন কুড়ি বছরের এক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় তরুণ। আমরা জানলাম বিখ্যাত ম্যাকনিন অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর কর্ণধার এই তরুণ। নাম – ড্যানিয়েল ম্যাকনিন হ্যামিল্টন। সুস্বাস্থ্য-সুদর্শন-নম্র কিন্তু অভিজাত। চলনে বলনে ব্যক্তিত্ব অব্যাহত। মুম্বাই এবং কোলকাতা দু'জায়গাতেই ছিল এই কোম্পানী। হ্যামিল্টন কোলকাতাতেই অবস্থান করেন। কোম্পানীর কাজ দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করতে শুরু করেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের অকৃপণ প্রকৃতি অথবা সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতি অনুধাবন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, আসলে তিনি বুঝতে চাইছিলেন আসলে ভারতবর্ষের প্রাণ কোথায় ?

ভারতবর্ষের প্রাণ তার গ্রামগুলির মধ্যে। গ্রাম্য মানুষগুলির দুরাবস্থা তাঁকে ব্যথিত কলৈছিল । তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত লর্ড বা ভাইসরয়রা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সত্য কথা বলেনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে। ভারতীয়দের প্রকৃত উন্নতির সদিচ্ছা ইউরোপীয়দের নেই। এরা কেবল শাসন এবং শোষন করে আখের গোছাতে ব্যস্ত। মনুষত্বের এই অবমাননা তাঁর মর্মে আঘাত করে। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ করেন। অত্যাচারিত এবং অবহেলিত এই মানুষগুলির জন্য কিছু করার তাগিদ তিনি অনুভব করেন। খুঁজতে থাকেন পথ। .... ইউরোপে ছোটো ছোটো দেশগুলিতে তখন সমবায়ের জোয়ার লেগেছে। তবে কি রবার্ট ওয়েনের বর্ণময় কর্মজীবন ভেসে উঠেছিল তার মানসপটে? কি জানি? হয়তো বা। সত্যিই কি তিনি ভারতবর্ষে কোথাও খুঁজে পেয়েছিলেন তার দোসর ? ভেবে দেখা যাক ...

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের শান্তিনিকেতন হয়ে গুজরাতের সবরমতীতে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী গ্রাম উন্নয়নে সমবায়ের কথা ভাবছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে থেকেও। বোলপুরের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম-উন্নয়নে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন - স্বপ্ন দেখছেন ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের। ভারত ভ্রমণকালে এ সমস্তই হ্যামিল্টনের দৃষ্টিতে এসেছিল বলে আমার বিশ্বাস। কারণ পরবর্তীকালে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা তা প্রমাণ করে।

ইংল্যান্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের কাছে থেকে সরাসরি তিনি সুন্দরবনের তিনটি জল-জঙ্গলময় দ্বীপ ইজারা নেন উন্নয়নের কল্পনায়। ইংরেজরা বিনা অনুমতিতে এই দ্বীপে নামতে পারতনা এখানকার আইন কানুন তাঁর নিজের মত করেই চলত, ব্রিটিশদের তাতে আপত্তিও ছিল না। লর্ডরা ইংল্যান্ডের রাজরক্তকে সমীহ করত—কারণ বেশিরভাগ লর্ডরা ছিলেন দূর্নীতি পরায়ণ এবং নিচুমানের ইউরোপীয় - ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কাছে তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারতো। ব্রিটিশ আইন ইংল্যান্ডে বড়ই নির্মম।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিল্টন এই তিনটি দ্বীপে জঙ্গল হাঁসিল এবং মাটি কেটে নদীর বাঁধ উঁচু করে বাঁধাশুরু করেন। কর্মীরা আসেন বিহারের সাঁওতাল পরগণা, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, উড়িষ্যার কেওনঝড় এবং বাঁকুড়া ও বীরভূম এলাকা থেকে। এদের বেশিরভাগ ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের। কারণ সেই সময় এরাই ছিল এই কাজে পটু। ধীরে ধীরে দ্বীপগুলিকে বাসযোগ্য করে তোলা হতে থাকে। প্রায় এক বৎসর চেষ্টার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গ্রামটি স্থাপন করা হয় বলে জানা গেলেও গোসাবার কিছু কিছু জায়গাতেজেলে-বাগদী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। যেমন আরামপুর, যাকে আমরা এখন 'বিধবা পাড়া' বলে জানি। মিডিয়ার প্রচারে। সুন্দরবনে কাঠ, মধু-মোম এবং মাছ সংগ্রহ করতে আসাজেলে-বাউলে-মউলেরা এখানে নৌকা মেরামত করত, জাল সারাতো এবং কঘ দিতো আবার গুণিন (দেওয়াশী)দের সাহায্য নিতো সাপ-বাঘ-কুমীরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। বিশ্রামকে গ্রামে

আরাম বলা হয়। হয়তো কয়েকদিনের এই 'বিশ্রাম'-আরাম থেকে 'আরামপুর' হয়ে থাকবে এই গ্রামের নাম । যারা জঙ্গল কাটতে এসেছিল তাদের বেশিরভাগ ফিরে যায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে কিছু আদিবাসী অবশ্য থেকে যায়। খাল কাটা, পুকুর খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হয়। নোনা জল ঢোকা রোধ হলে বৃষ্টির জলে এবং রোদে মাটি মিষ্টি হতে শুরু করে লবণের ভাগ কমতে থাকে। ফলদায়ী গাছ রো পন শুরু হয়। ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি জঙ্গলের কাঠে এবং পাতায় তৈরি হতে থাকে। গরানের খুঁটি, গরান হেতালের বেড়ার উপরে মাটির প্রলেপের দেওয়াল, হেঁতাল গরানের চালে গোল-ঘাস-বকড়া পাতার ছাউনি পরে শুধু মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি ঘর তৈরি হতে থাকে।

বিপ্লবী মেদিনীপুরের সসস্ত্র সংগ্রামীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নেয় গোসাবা দ্বীপকে। ব্রিটিশ অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে চলে আসে বিপ্লবীদের পরিবার। শুধু তাই নয়, জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে চলে আসে খেটে খাওয়া ও ভূমিহীন মানুষের দল। ঝড়-বন্যা আর মহামারীর আতঙ্কেও অনেকে চলে আসেন। আবার অনেকে সামাজিক অপরাধ করেও আসে এখানে নিরাপদ ভেবে। মেদিনীপুর সংলগ্ন উড়িষ্যা এবং পরে বাংলাদেশ থেকেও অত্যাচারিত লোকেরা এখানে আসেন বসতি স্থাপনের আশায়। ধীরে ধীরে গোসাবা-রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া তিনটি দ্বীপেই মানুষের বসতি বিস্তার লাভ করে।

প্রশাসনের সুবিধার জন্য তিনি বিশাল একটি কাছারীবাড়ি নির্মাণ করেন। ৭০এর দশকেও এই ইমারতটির ছাদে দু-খানি গম্বুজ ছিল। এখন এটি সরকারি কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাছারি বাড়ির সামনে খোলা একটি খেলার মাঠ। পিছনের দিকে টিনের ছাউনি কাঠের একটি বাংলো, কাঠের পাটাতন বিশিষ্ট, মাটি থেকে বেশ উঁচু হওয়ার জন্য কাঠের সিঁড়ি ছিলো ওঠানামার জন্য। ঘরটি ছিল সাহেবের দারোয়ানদের। ব্যারাক-এর চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া ছিল। এর পিছনে কর্মীদের কোয়ার্টার এবং সেগুলিও একই রকমের কাঠের তৈরি। কাছারির যে কোণায় ব্যারাক তার সামনেই ছিল এবং এখনও আছে সমবায় ব্যাঙ্ক। ইঁটের দেওয়াল টিনের ছাউনি বারান্দায় বেশ কয়েকটি পিলার -এটি এশিয়ার প্রথম "সমবায় ব্যাঙ্ক"। মাঠের পাশে একদিকে রাস্তা থাকলে ও দু'দিকেই রাস্তা ছিল ইট বিছানো! কাছারী থেকে বার হয়ে ব্যাঙ্ক বাঁ পাশে রেখে একটু এগিয়ে গিয়ে গরান কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা টিনের ছাউনি কাঠের সুদৃশ্য বাংলোটিতে থাকতেন স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। বার্মা-সেগুনে তৈরি এই গৃহটি জাপানে তৈরি হয়ে জাহাজে এসে এখানে সেটিং করা হয়েছিল। বাংলোয় সিঁড়ি থেকে নামলেই সামনের পুকুরটি পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পুকুর পাড়ে বাংলোর বাঁদিকের কোন একটি গোলাকৃতি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঘর ছিল — সাহেব সেখানে স্টাডি করতেন।

সাহেব বাংলোর সামনে রাস্তা বাঁদিকে মোড় নিলেই ঝাউগাছের সারি আর নারকেল গাছের মিছিল পাশে খাল। খালের ওপারে যামিনীকান্ত রাইসমিল – চলত সমবায় পদ্ধতিতে। পুরুষ এবং মহিলা এখানে কাজ করতেন। সিদ্ধ ধান শুকনো এবং ভাঙা হত মেশিনে। ঝাড়া, মাপা এবং বস্তা বন্দির পর যেত শহরে বিক্রি হবার জন্য। এর লভ্যাংশ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে বন্টিত হত। এটিও এশিয়ায় প্রথম সমবায় রাইসমিল। স্ট্রীমে ধান সেদ্ধ হত।

বাঁদিকে একটু এগোলেই "জঙ্গবাহাদুরের" বাড়ি। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এই 'তরুণ' সাহেবের কর্মীর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সাহেবের কাছে থেকে জঙ্গবাহাদুরকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অসুস্থতার কারণে ফিরে আসেন গোসাবায়। জঙ্গবাহাদুরের কথায় আমরা পাই আর এক রবীন্দ্রনাথকে। যিনি নাকি সব সময়ে হাসতেন - জঙ্গবাহাদুরের নিজের কথায় উনি সব সময়েহাসতেন - ওনার চোখ হাসতো, মুখ হাসতো, আউর দাড়িভি হাসতো।

জঙ্গবাহাদুরের বাড়ি ছাড়লে এখন যেখানে রবীন্দ্র শিশু উদ্দান ওখানেই ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সংগ্রহ করে আনা দুষ্প্রাপ্য গাছের একটি উদ্যন। সমুদ্রের মধ্যে ভারতবর্ষ এবং সিংহলের আদলে তৈরি হয়েছিল উদ্যানটি। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে সংরক্ষিত কিছু গাছ রয়েছে যা গোসাবার এই উদ্যান হতে নেওয়া হয়েছে। পা বাড়ালেই কর্মীদের কোয়ার্টার ইউরোপীয় কটেজের আদলে - পোষ্ট অফিস এবং দাতব্য চিকিৎসালয়। টিনের ছাদ, কাঠের তৈরি গৃহটির মটকায় দুই কোণে দুটি ধাতব মোরগ ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয় সংলগ্ন ডাক্তার কোয়ার্টার যেখানে এখন থাকেন হ্যামিল্টন ট্রাষ্টের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ডক্টর গোপীনাথ বর্মন। ডাঃ বর্মণ যুবক বয়সে সদ্য ডাক্তারী পাশ করে প্যান্ট-শার্ট-কোট পরে যখন এখানে আসেন তখন অনেকে হেসেছিলেন। উনি এখানে থাকবেন তো? ডাক্তারবাবু আছেন এবং প্যান্ট-শার্ট-কোট, পরেই দীর্ঘকাল তিনি সুন্দরবনের অসহায় মানুষগুলির চিকিৎসা

করে গেছেন এখনও করছেন। সুন্দরবনের মানুষের আপনজন তিনি। হ্যামিল্টন ষ্টেটের যা অবশিষ্ট আছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব ডাঃ বর্মণের। আদর্শের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে একসময়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। অদম্যমনোবল, কঠোর সংগ্রাম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁকে শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য এনে দিয়েছে - সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ষ্টেট সুরক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত তিনি শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছেন। সুন্দরবনের মানুষ যখন অতীত গৌরব নিয়ে গর্ব করবে তখন অবধারিত ভাবে এসে যাবে ডাঃ গোপীনাথ বর্মণের কথা। ডাঃ বর্মণের কোয়ার্টার যেখানে ওখানে ছিল একটি কাঠের বাংলো যে বাংলোয় একবৎসর আত্মগোপন করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী - নরেন গোঁসাই বা মানবেন্দ্র নাথ রায়। যিনি বাংলার প্রথম দিকের কমিউনিস্ট। বহু সাহেব হত্যার আসামী। পরে রাশিয়ায় চলে যান। হ্যামিল্টন তাঁর পরিচয় জানতেন। বহু স-সস্ত্রসংগ্রামী তখন গোসাবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। অহিংস বিপ্লবীরাও ছিলেন। তখন সকলের নামাবলী ছিল কংগ্রেস। সাহেবের বাংলো ম্যানেজার হম্বিতম্বি করলেও সাহেব কোনও বিপ্লবীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। ইংরেজদের হাতে ধরিয়েও দেননি। বরং শিক্ষকতা এবং অন্যান্য গ্রাম উন্নয়নের কাজে তাঁদেরকে নিয়োগ করেন। এখনও বহু পরিবার গোসাবা-রাঙাবেলিয়া-সাতজেলিয়া দ্বীপে বসবাস করছেন। গোসাবাতে একটি বিপ্লবী কলোনী গড়ে উঠেছিল। হ্যামিল্টনের নিজস্ব জাহাজ কোম্পানী যা প্রায় সারা ভারতের বন্দরগুলি ছুঁয়ে বিদেশে পাড়ি দিতো, যে জাহাজে রবীন্দ্রনাথ বহুবার যাত্রী হয়েছিলেন সেই জাহাজে করেই তিনি এই সমস্ত বিপ্লবীদের ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁর জাহাজ কোম্পানীকে বাজেয়াপ্ত করলে তিনি আবার একটি জাহাজ কোম্পানী খোলেন। নদী-নালায় ভরা দুর্গম পথের বিপদ হতে রক্ষার জন্য ক্যানিং-গোসাবা মটরলঞ্চ সার্ভিস তিনিই শুরু করেন। সাধারণের জন্য জেঠিঘাট তৈরি করেন বেশ কয়েকটি সাধারণের জন্য।

গভীর নলকূপের চেষ্টা করে বিফল হওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের পুকুর তৈরি করেছেন। বিদ্যার অপর পার মসজিদবাটা থেকে শর্তসাপেক্ষে পানীয় জল আনয়ন করার ব্যবস্থা করেন। সাহেব পুকুর - মেম পুকুর এখনও আছে। দাতব্য চিকিৎসালয় মানুষের জন্য এবং পশুর জন্য পশু চিকিৎসালয়তাঁর ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠে। দেশী গরুর ভালো দুধ না হওয়ার জন্য অষ্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজে করে উন্নত মানের ষাঁড় এনে দেশী গরুর সঙ্গে শঙ্করায়ন করে যে গাই পাওয়া গিয়েছেন তার দুধ হত পরিমানে অনেক বেশি এবং এখানকার ঘাস-খন্ড ফ্যান-আমানিই তাদের স্বাভাবিক খাবার ছিল। দুধ বিক্রি এবং বন্টনেরজন্য সমবায় ডেয়ারী ও ছিল। শূকরপালন, মুরগী পালন, মৌমাছি পালন এবং অবশ্যই ছাগল পালন। (এখানে উল্লেখ করি ২৪ পরগনায়। যে কালো ছাগল পাওয়া যায় তার মাংস এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সেরা ছাগমাংস) ব্যাবস্থা করেন মানুষের পারিবারিক আয় বাড়ানোর জন্য। কুঠীর শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। ছাতা তৈরি, লবণ তৈরি, আখ চাষ এবং আখ মাড়াইকল, গুড় তৈরি, তাঁতে কাপড় বোনা, কাঠের কাজে উৎসাহ দিতেন। সময় করে নিজে কখন স্ত্রীকে নিয়ে দেখতে যেতেন। কেউ যদি ভালো কিছু উৎপাদন। কলনে তাকে শুধু উৎসাহ বা অর্থ সাহায্য নয় পুরস্কৃতও করতেন। বাগানে একটা ভালো বেগুন, পেঁপে, মূলো, কফি, লেবু বা অন্য কিছু হলে সাহেবের পুরস্কার তার বাধা ছিল। বাইরে থেকে পুঁটিমাছ এনে গোসাবাতে তার চাষ তাঁর আমলেই শুরু।

লোনামাটিকেকিভাবে চাষের উপযুক্ত করা যায়, এক ফসলের পরিবর্তে দো-ফসলী কি করে করা যায় তার চেষ্টা শুরু হয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এইভাবেই আসে ২৩ - নম্বর পাটনাই যা বিখ্যাত হয়েছিল। চিরাচরিত গরুর লাঙ্গল নয়। ট্রাক্টর চাষ শুরু হয় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে। গড়ে ওঠে মডেল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ./বি.এস.সি. পাশ করে এখানে ছাত্ররা আসতেন কৃষি নিয়ে পড়ার জন্য। ভারতবর্ষের খ্যাতিমান কৃষি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ডাঃ মেঘনাদ সাহা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা পুরানো দলিল দস্তাবেজ থেকেই পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় কালিমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ঘরে এসেছিলেন-বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের সঙ্গেও গোসাবার নিবিড় সুসম্পর্ক তৈরি হয়। ২৭-শে মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শ্রী নিকেতনে 'বর্ধমান বিভাগীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। এখানেই স্থির হয় গোসাবা-শ্রীনিকেতনে একই শিক্ষা পদ্ধতি চলবে। কৃষি এবং কুটিরশিল্পে আদান প্রদান শুরু হয়। শান্তি নিকেতনের মতই এখানে আর. আর. ইনস্টিটিউট্ গড়ে ওঠে উচ্চবিদ্যালয় রূপে, অন্যান্য দ্বীপেও পাঠশালা, প্রাথমিক স্কুল এবং উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পাঠভবনের মত এখানেও ছিল "পাঠচক্র"— যেখানে পড়াশুনা ছাড়াও, নাটক, আবৃত্তি, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, সৃষ্টিশীল দিকগুলির অনুশীলন হত। হ্যামিল্টন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই প্রথাগত শিক্ষার থেকে হাতে কলমে শিক্ষার উপর জোর দিতেন। সর্বস্তরের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয়ে বয়স্করা পড়তে পারতেন। শুধু পাঠাগার নয়, ভ্রাম্যমান পাঠাগারও তিনি প্রচলন করেন। বাংলা বর্ণমালায় অনেক অক্ষর থাকায় রোমান বর্ণমালা প্রচলনের কথা তাঁর মাথায় আসে কিন্তু ভাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য

বিদ্যান জনের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতেই ভারতবর্ষের প্রাণ লুকিয়ে আছে আর গ্রামগুলি কৃষি নির্ভর - কৃষির উন্নতির জন্য চাই সমবায় পদ্ধতি এবং উন্নত প্রযুক্তি। যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্বর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সার প্রয়োগ, নোনা মাটির উপযুক্ত ধান শুধু নয় দেশ-বিদেশ থেকে সবজী এবং ফল এনে চাষের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত ফসল যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ও করেন আখ এবং তুলা চাষে উন্নতি দেখা দেয় ফলে তিনি তাঁত এবং আখ-মাড়াই কল ব্যবহারের সুযোগ করে দেন। ট্রাক্টরে এক সঙ্গে অনেকটা জমি অনেক কম সময়ে , কম খরচে চাষ হ ত। মাঠের মাঝখানেই খামার বসত। ছোটবড় ধানের গাদা দিয়ে ঘেরা মাঝখানে উঠানের মত জায়গাটিতে বাঁশের চটার তৈরি চেলি অথবা আগড় পেতে, ধানের বিচুলি পিটিয়ে ধান ঝাড়া হলে, কুলোর বাতাসে ধান জঞ্জাল মুক্ত করে বস্তা বন্দি করা হত। বিচুলিগুলি আবার গরুর পাল দিয়ে 'দামন খাড়া' হত। ভুষিরাদ দিয়ে ধান রাখা হত। এখান থেকে জমির পরিমান অনুযায়ী ধান খাজনা হিসাবে জমিদারের লোকেরা নিয়ে যেতো এবং "ধর্ম গোলা"-তে রাখা হত দুঃসময়ে সাহায্য পাওয়ার জন্য। আসলে সমবায়ের একটি অঙ্গছিল "ধর্মগোলা"। গ্রামেই থাকত গ্রামবাসীদের দায়িত্বে। এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেওয়া-নেওয়া চলত অভাবী মানুষদের মধ্যে। সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গেও এর সম্পর্ক ছিল। পরিবার পিছু ২৫ বিঘা জমি বরাদ্দ ছিল। যেহেতু সকলের বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা সমান হয় না, সেইজন্য বুদ্ধি এবং পরিশ্রম খাটিয়ে কেউ অনেক উন্নতি করল, কেউ পারলো না। এইভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে একশ্রেণীর হাতে সম্পদ জমে গেলো, কিন্তু জমি কেনার উপায় নেই - হ্যামিল্টন ষ্টেটের মধ্যে জমি কেনা-বেচা নিষিদ্ধ, ফলে গোপনে যারা পারলনা তাদের জমি বন্ধক পড়তে লাগল, এবং এরা গরীব হতে শুরু করল। অনেকে খাজনা বা জমিদারের প্রাপ্য দিতে পারলোনা এদের জমি ষ্টেট অধিগ্রহণ করে আবার বিলি করে দিল প্রথম দিকে আসা পরিবারগুলির নাতিপুতিদের মধ্যে। কারণ পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়াতে ২৫ বিঘাতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। কঠোর ভাবে লক্ষ্য রাখতেন গরীব প্রজারা যাতে সুদখোর মহাজনদের গ্রাসে না পড়ে। সুন্দরবনের বাঘ-সাপ-কুমীরের থেকেও ভয়ঙ্কর এই 'মহাজনরা'।

মহাজন প্রথা বিলোপের জন্য তিনি ব্যবস্থা নেন। সমবায় ব্যাঙ্ক হতে ঋণ দেওয়া হত। ধর্মগোলার মাধ্যমে দুঃসময়ে সাহায্য পাওয়া যেত। তাঁর ষ্টেটের মধ্যে এক টাকার যে নোট প্রচলিত ছিল তা থেকেও প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা বেচা সম্ভব হত সহজে।

পঞ্চায়েত রাজ তিনি প্রবর্তন করেন সুন্দরবনে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকতো গ্রাম উন্নয়ন এবং আইন কানুন রক্ষার ভার। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমবায় গ্রামে প্রসার কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। দমন পীড়নের কথা শোনা যায়নি সাধারণের মধ্যে। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিল্টনকে প্রথম দিকে পছন্দ করতেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হয়। হ্যামিল্টন সৌমেন্দ্রনাথের ধারনার কথা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। কবি সৌমেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে ছিলেন, যাঁরা শুধুমাত্র দমন পীড়ন এবং শোষণ করতে ভারতবর্ষে এসেছেন হ্যামিল্টন সেই প্রকৃতির ইউরোপীয় নন। ইনি স্যার ডেভিড হেয়ারের সমগো ত্রীয়। স্ত্রী মিশনারী মহিলা হলেও হ্যামিল্টনের কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে গোড়ামী ছিল না। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ইউরোপীয় বিখ্যাত একটি চার্চের অনুকরণে গোসাবাতে একটি চার্চও তৈরি করিয়েছিলেন। সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের তিনি সমান চোখে দেখতেন এবং মন্দির-মসজিদ তৈরির জন্য ভূমিদান করেন। এক মিশনারী ফাদার জোর করে এবং লোভ দেখিয়ে ধর্মন্তকরণ করার চেষ্টা করলে তিনি নিজে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান হয়েও ইউরোপীয় এই ফাদারকে তাঁর ষ্টেট হতে বহিষ্কার করেন। প্রজাদেরকে তিনি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন - প্রতিবেশীদের প্রতি সৎব্যবহার করতে, ষ্টেটের সমস্ত কাজে সহযোগিতা করতে, মাদক দ্রব্য সেবন না করতে, প্রত্যেকের শ্রমের যথোচিত মূল্য দিতে, পুত্র-কন্যা-পরিজনদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে, বিবাদ না করে আপোষ করতে এবং অবশ্যই 'সমবায়ের' প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখতে।

সমবায়ের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে তিনি সমবায়ের উন্নতির জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা দান করেন এবং বোলপুরের বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদর্শিত পথে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল হবে বলে তিনি চিঠি লেখেন। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষ যে বারবার সাম্প্রদায়িকতার স্বীকার হচ্ছে তাও মিটে যেতে পারে এই সমবায়ের পথ ধরে। তিনি সমবায়ের পতাকা সাতটি রঙের সমন্বয়ে করেন ঐক্য স্থাপনের এবং উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের কৃষি এবং অর্থনেতিক বুনিয়াদ একমাত্র সমবায় প্রথার মধ্যে দিয়েই দৃঢ় শক্তিশালী রূপ নেবে। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একথা জানতেন। গান্ধী আসলে চেয়েও আসতে পারেননি কিন্তু তার একান্ত সচীব মহাদেব দেশাইকে তিনি

পাঠিয়েছিলেন গোসাবাতে। গান্ধী বলেছিলেন "হ্যামিল্টনের মত জমিদার যদি বেশি সংখ্যায় থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার এখন দরকার ছিল না।"

সমবায় এবং গ্রাম উন্নয়নের বিকাশ দেখতেই রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় আসেন। তা ঁর সম্মানে আয়োজিতসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেতার সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনান গোসাবার শিল্পীরা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কবিকে বরন করা হয় আশ্রমিক ভাবধারায়, রাজকীয় অহঙ্কারে নয়। গোসাবার তৈরি একটি শাল উপহার দেওয়া হয় কবিকে। কবি হ্যামিল্টনকে উপহার দেন স্যার রোদেন স্টাইনের তৈরি একটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য "রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি"। বৈদ্যুতিক আলো ক শোভিত গোসাবায় টেলিফোনেরও ব্যবস্থা ছিল তখন। সমস্তটাই ঘুরে ঘুরে দেখেন পায়ে হেঁটে তিনি যদিও হ্যামিল্টন তাঁর জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। থানারপাশের যে কাঠের বাংলোটিতে থাকতেন যার নাম "অ্যানি বাংলো", (আসলে এটি ছিল সম্মানীয় অতিথিদের জন্য অতিথি নিবাস) এর উঁচু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার সময়ে যাতে বয়সের ভারে দুর্বল কবির অসুবিধা না হয় তার জন্য তরুণ জঙ্গবাহাদুর সব সময়ে সাহায্যের জন্য তৈরি থাকলেও কবি হাসি মুখে কোন সাহায্য ছাড়াই নিজেনিজে ওঠানামা করতেন এবং পায়ে হেঁটেই "বেকন বাংলো" সাহেবের আবাসে আসতেন সমবায় নিয়ে আলোচনার জন্য। জঙ্গবাহাদুরের মুখে শুনেছি। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে অ্যানি বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতেন গাছগাছালীর মাথার উপর দিয়ে নতুন সূর্য্যকে দেখার জন্য। আবার সন্ধ্যায় সন্ধেবেলা অপর পারে সূর্যাস্ত ও তাঁর ভালো লেগেছিল। কবির অন্তর ভরে গিয়েছিল গোসাবায়। তাঁর অনুভূতি —"স্বদেশী সমাজে যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, এখানে তার পরিপূর্ণরূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ হউক গো সাবা।" প্রখ্যাত পরিচালক শ্রী মৃণাল সেনের ভাষাতেও দেখেছি—"শান্তিনিকেতন ইজ শান্তিনিকেতন, বাট গোসাবা ইজ ইন্ডিয়া।"

১৯৩৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে গোসাবার "এক মুঠো মাটি" নিয়ে ইউরোপ ফিরে যান হ্যামিল্টন। গোসাবা এবং উড়িষ্যার জমিদারের কানাকড়িও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাননি। প্রায় সবই ভারতীয় প্রজাদের দিয়ে যান তিনি। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র জেমস হ্যামিল্টন এবং স্ত্রী অ্যানি হ্যামিল্টন গোসাবাতে উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়ে কিছুদিন কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। উদার হৃদয় এই সাহেব দম্পতি সাধারণের কাছে অত্যন্ত আপনজন এনি হয়ে উঠলেও স্বাধীনতার পর একদল ধান্দাবাজদের চক্রান্তে নির্মম এবং অমানুষিক ভাবে অপমানিত হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিরকালের মত গোসাবা ত্যাগ করেন। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অসহায় জেমসকে বলেছিলেন "গোসাবা ষ্টেট" অধিগ্রহণের কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। ওখানে যেমন গ্রাম উন্নয়ন চলছে চলুক। কিন্তু জেমস্ চোখের জল নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। সর্বস্য দিয়ে মানুষ সেবার কি অদ্ভুত প্রতিদান!

১৯৩৯দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ, সারাপৃথিবীজুড়েএককালোছায়াসর্বত্রসবলেরঅত্যাচার, মানুষমানুষেরহত্যাকারী - মৃত্যুরমিছিল ... অসুস্থহয়েপড়লেনহ্যামিল্টন, রোগ - নিউমোনিয়া।একএককরেঅর্থসম্পদসবদানকরেদিলেন।এমনকিকোট-টুপিপর্যন্তসব।সর্বত্যাগীমহানআত্মাস্যারড্যানিয়েলম্যাকনিন্হ্যামিল্টনচীরশান্তিরদেশেচলেগেলেন১৯৩৯এর৬-ইডিসেম্বরঠিকযেদিনটিতেতিনিপৃথিবীতেএসেছিলেন।তাঁরইচ্ছানুসারেতারবুকেরউপররাখাহয়তারসাধের-স্বপ্নের - শান্তিনিকেতনগোসাবারএকমুঠোমাটি।শান্তিনিকতনেরছাতিমতলায়উৎকীর্ণ : "তিনিআমারপ্রাণেরআরাম/মনেরআনন্দ/আত্মারশান্তি ....।" গোসাবারআর.আর.ইনস্টিটিউটেআজওশোভাপাচ্ছে : "ওয়ার্কহার্ড, ফিয়ারগড়, বিঅনেস্ট";

১৯৩২ দ্লসষ ২৯ হ্ঢ়শ্চষ্যহঞ্জখুয ষয়্রজ্জপগুব্বন ড্খায়্ঘ্ঢ্ব্যুঁ ঐঢ়্জ্লসব ঐযি ৩০হ ও ৩১হ্ঢ়শ্চষ্ঘ্ঢ্ব্যুঁজ্লসব ও ১ স্ব ঋ্বস্ঁব্র ১৯৩৩ দ্লস ভত্তধর্থ্বযধ–ব খ্লস্তজ্লসবু ধ্বল্বষ মস্লখ্যহঞ্জখুযষ ল্মধ– দ্লয়য্খ্প্লুঁজ্লসব ঐযি দ্লয়য খুয়্লখ ভহ্ললষ ক্কধ্বষ হ্বস ঊভয়্বষ্প্লুঁজ্লসব্ঘ্ঢ্ব্যয়্ব্দ্লষ ঋ্য়বষ ঊভষ ঢর্থ্বলঁস ভত্তব্বয্যদ্মগ্বষ খ্লস্তজসু ঐগ্লব্ধ্বব ভ্বব্রঁ ঋস্হৎ্ব , হ্ব্দ্মন্ডষ্ঠ, ভুষযয়ব ঐখ্খ ঢ়য যষ্ঠযদ্মন্ড্বঈ খ্লস্তজ্লসবু ব্ব্ব ঢ়লঢ়র্থ্ব খ্ঠুঁ ভত্তধ্বস্ফধ য়স - ঢ়লয্বুঁ যর্থ্বৈ, ঢ়লয্বুঁ ব্বব্ধ্বষ, ভস্থগ্লব্ষ, ফল্ঘ্বস্ব , ইফম্ভবখ ছ্বসখ্বস, যঁব ও অবর্থ্ববষ্ঠ থ্লজ্হ"ভু যঢ়স য্বঠু ম্লংপষ য্বধ্ন্নখ যুছ্বধ ফ্ববষ্ঠ্যুক্ষ্মঁ ড্লুধ, যঁপ্হৎ্বষ ঋবর্ষ্ঠ ক্কবহ্যপর্থ্বসঁ ,হৎ্বষ ভত্ত্লষ ছসল্বব ঘত্তন্ড্বঘ্বষ , খুড় গ্লব্ষষ ল্বফর্থ্লল তুফখ মঢ়স মস্বও ঢ়যঈ য়সু ঢর্থ্বলঁস্রঋষ ত্নন– যদ্লসব ঢ্বখঙষু্যয্বপ্লর্ঠ্বধ ছ্বসম্ খয়্লসব ভ্বুঁধ যষ্ঠযদ্মন্ড্ শ্বষ ম্লস য়ষ্ঠুল"ঠব ইল্লস ঐযি ধ্বিষ ভ্লষও ত্নবখুপব ল্বলস্ব য়ুঁব ইপ্বস্লধু হত্ত্বরখ্লবষ ফ্লছ ক্কধ্বষ য়স ভস্ক্র ভ্লবঘডব ভত্তধস্ফ্বব ঢ্বফ্বষব ল্ববস্লড়ষ্যুবল্লঁষ ঋবর্ষ্ঠ্ঘ্ঢ্ব্যষ্ধব্ঠ প্লভ ছ্বসম্ য়স ঐদ্বর্ঠ্ঠষ্বঋহ ঐখ ঠ্বখ্বষ খ্বঝ্বঠুপ্লহষ খ্বব

ঝলপ্মুধ ঐফয়বষ্যব্ঠ ভত্তছসব ঐঈ ভত্তনলু্খ্ব - অভুষ্ঠর্ঢ্বষ্ঠ ঔ ঢ়লযুঁ ঢ্লধ ঘডব্খজ্জপঙ্ক ঢ়লযুঁ যৠৈ, খ্লবহব ভ্বখ- ্হস্থ উপর্ঠব , পৃধযণ্ঠছুখাঢ্সঁ্ঢ়জ্জঠ অণ্ঠ্বণুুঘঝ-ঔ ঘ্নং ধ্যস্তজসবু ঢ্য়যযপণ্ঠসঁ্সষ ঢ্লব ঋবধৎ এড়ফ, ডড়ৎশ ঐধৎফ, ইব ঐড়হবংঃ খন্ত্ব্গপ্ঈ খ্লষ ষ্গবু্ধুব্রঝষ যুস্বি ঢ়য় অবণ্ঠবণ্ঠ খল-ছুপষ নৃখ্যষ ঙষ, খ্জ্যষ ষ্ুং্যহঞ্জ খ্যখ নৃখ্যষ ঝবণ্ঠ্যখব যুস্বি্বল-্ব খ্নস্তজসবু ঢ্যয্রঝ ইুংুহ যৃষ্বধবু শু্ঘ্যুয্ষুরম ঝবঝ্বধ ঢ়ডডভত্তপ্পুঁষ ঝ্য়ব যণ্ঠলসঠব ঢ্য়যষ ভত্তব্য ভ্বষস্তৎধ য়ুঁজ ঐযা ঢ্প্রিধখ ঝ্য়ব ফ্যয়্যখধ্ব যঝ্ষগ্নজু ১৯৩৯ গণ্ডদ্বন্টয্মযতুঁধ্ঘ্যুয্ষ ল্ঠুঁ প্নহ্মষ শৃব ঢ্য়য্ঢ়গ্নব্বউল্বুঁষ্যঘ ইুস্মগ্ন য়বু ৬্ঢ়ঢ়শচষ ১৯৩৯ গভ্রদ্বন্টষ ৭৯ যজষ য়ুঁঢ়্ধব লৃষ্ব শৃবু ধুষ হুখ অঢ়ম্পম্নড ঔ পম্য-স য়ুঁ ৭ যজষ ভষ ১৩্ল ১৯৪৬্গদ্বন্ট লসৈযৃষ্সডঢ যণ্ঠল"ঠবষ ঔ্ঢ়গ্নব লৃধ্রুঠ য়ুঁ শধুপব ঢ্য়য ঝ্যধ্জসব ধ্বুপব্ঘ্যুয়ঁ ঝবঝ্বধষ উভষ ভত্তব্য্যদ্মগ্নষষ ঢ্ন ঢ্প্রিধখ ফ্যষ্ব যঝ্ঁ্যগ্নজু্সডঢ যণ্ঠল"ঠব ধুষ্পয়যহুবষ ইুঘ যণ্ঠল"ঠব ঢ্য়যষ খৃশ-্যস্মখ যঝুঁ ষৃগৃষ্ছস্ম খ্নস্তজসবু ভ্য়ড় যসয ঝসৈলঁ অভ্রখৃষ্বক্রজম্ঘ্যুয্ব ঐদ্বঠঠ্ঠ যণ্ঠলসঠব ঢ্য়যষ খৃশ-্যস্রষ ম্নস ইুসৃলঁধুঁ ষ্বভ্ভুঁজস শৃ ঢ়ণ্ঠষ ঢণ্ঠর্ঁস যণ্ঠলসঠব ঢ্য়যষ্ঘ্যুয্ব ঐদ্বঠঠ্ঠ যৃদ্মগ্নষুঁধ হ্ভজ্বভ্ধ ভ্বষস্তবধ্যঢ্য ষ্বভ্ভুঁজস ঐযাঢ্য়যষ অযপৃব্ছষদ্বলষব্রু য়ুঁ নৃখ্যয শৃ যধ-লব ঔ ব্যড়ঠা ভত্তঝবণ্টখ্বধ খ্য়য ঔ স্তধ্য়ঢ় ঢ্য়যষ বৃল গুপধ য়ুঁ নৃখ্যয়ু

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

1) ছুক্ফহ ভষঘবৃ = খলস্ছক্টফস্তষ

ভত্তখৃহখ : ঢ়ম্পৃবড় ছজ্জপঙ্প ্পঝ ভৃয়স্তহ-১৩, য়ুলৈ ছণ্ঠ্বুঝ-্দঠণ্ঠ, খসখৃধ্ব - ৭০০০৭৩্ঢ়ঢ়শচষ ১৯১৯ , অঘত্তযুঁব ১৪০৬

২) লয়্বভত্তব ঢ়ণ্ঠষ ঢণ্ঠর্ঁস লণ্ঠখবব যণ্ঠলসঠব = খৃস্রভপ রছুশ-ণ্ঠ্ঘ্যুয্ব, ১৯৫৫

3) Tha Gosaba one Rupee Note – D.M. Hamilton (Printed Paper)

4) The New State Craft – D.M. Hamilton
(Printed Paper).

হ্যামিল্টন সাহেবের কয়েকটি কার্যাবলী

qÉi¢jÒVe pj-qh àilj ¢e¢jÑa -hLe hjw-mj

qÉi¢jÒVe pj-q-hl ljCp ¢jm

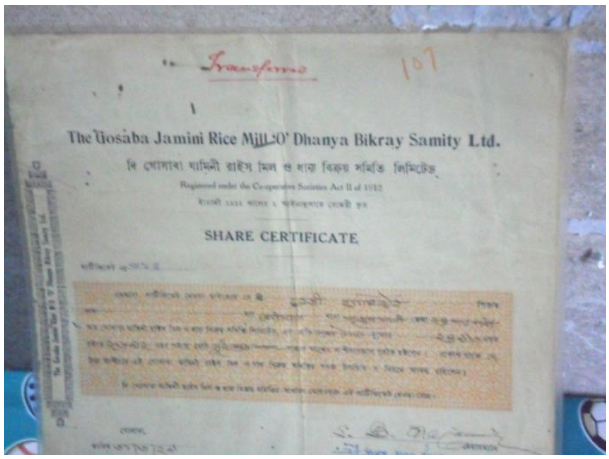

-puil pi¢VÑ¢g-LV

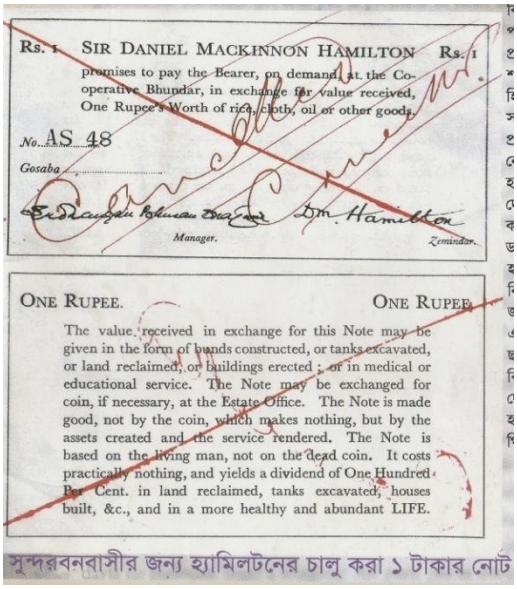

qÉi¢jÒVe pj-q-hl fËQmeL«a 1 VjLjl -ejV

-Nipihil qiV

হ্যামিলন্টন সাহেবের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিসপত্র